।। পরিণাম কথা ।।

এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির টানে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যচর্চায় অংশ নিয়েছেন এবং প্রথমাবধি তাঁর অভিনয়ে, মঞ্চপ্রয়োগে সমকালীন নাট্যধারার মিল থাকলেও নাটকের পাঠ থেকে মঞ্চায়ন পর্যন্ত এক অনায়াস অনুভব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধারণ একজন গীতিকবি না হতেন, তাতেও তাঁর নাটকের এই স্বভাব বদলাত না। সমকালীন সমস্যা বা প্রবণতা অপেক্ষা মানুষের চিরকালীন অভিজ্ঞতাকে তিনি নাটকে ধরতে চেয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় সংলাপের গভীরতায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, দশো বছরের বাংলা থিয়েটার রবীন্দ্রনাটকের সেই সংলাপ ও চরিত্রায়নের গভীরতায় পৌঁছবার পথ অর্জন করতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ হল, গোড়া থেকেই বাঙালির নাট্যবোধ তথা নাট্যসংস্কার গড়ে উঠেছে বিলাতি কাঠামোর উপর নির্ভর করে। তাই যখনই বাঙালি নাট্যকর্মীরা জাতীয় নাট্যরীতি অনুসন্ধান করতে গেছেন, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্শ্বিক অনুকরণ। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগে যেমন যাত্রার করণকৌশলগুলিকে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কাজে লাগিয়েছেন বিলাতি কাঠামোর মধ্যে থেকেই। যে অনুধাবন নিয়ে তিনি গড়ে নিয়েছিলেন তাঁর সংলাপের ভাষা, 'গৈরিশী ছন্দ', সেই অনুধাবনায় তাঁর পক্ষে একান্ত নিজস্বভাবে কোনো রঙ্গনাট্যরীতির নির্মিতি সম্ভব হয় নি মঞ্চের নিরন্তর চাহিদার গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে। তাঁর সময়েই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় মানসের অখণ্ডতায় পৌঁছবার যে প্রয়াস চালালেন, তার ব্যাপক রসাস্বাদন সম্ভব হল না পেশাদার মঞ্চে। ঐ মঞ্চ তাঁর জনপ্রিয়তার শর্ত পূরণকারী নাটকগুলি, যেসব শর্তের ইঙ্গিত আমরা আগে দিয়েছি, সেই নাটকই গ্রহণ করেছে। অপরপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তর অপেশাদার নাট্যকর্মের প্রাধান্যময় যুগে নিরন্তর রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত সেই জাতীয় মানসের অখণ্ডতা ক্রমশ অস্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ফলে তাঁর নাট্যের প্রকরণে, বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সামগ্রিক জীবনসাধনা, জীবনের সংগ্রাম ও পূর্ণতার জাগরণ ঘটাতে চান, তার মর্ম গ্রহণ করাও সচরাচর সম্ভব হয়নি। বিগত পঞ্চাশ বছরের নাট্যপরিক্রমা লক্ষ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ গোষ্ঠীর অধিকাংশ নাটকই জোর দিয়েছে সমকালীন পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও তার সংগ্রামের দিকে। 'নবান্নে'র পরবর্তী গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণাজাত নাটকগুলিতে

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চেহারাটিও প্রায় নীরক্ত, আদর্শসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপল দত্ত, যিনি আজীবন নাট্যশিল্পকে 'শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার' মনে করে এসেছেন, তিনিও বামপন্থী চেতনায় লিখিত নাটকগুলিকে এই সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু, এইধরণের নাটকগুলিকে সরিয়ে রাখলেও আধুনিক নাট্যচর্চা প্রধানত সমকালীনতার দিকেই জোর দিয়ে এসেছে। এমন কি যেসব পশ্চিমী নাটকের রূপান্তর-অনুবাদও নির্বিচারে অভিনীত হয়ে এসেছে, হয়ে আসছে — হয়তো বা কিছু দুঃসাহসের সঙ্গেই বলা যায়, সেগুলির নির্বাচনের মূল ঝোঁকই ছিল সমসাময়িকতার দিকে, কারণ আধুনিক নাট্যকর্মে সমকালীনতাই আধুনিকতার নামান্তর। তৎসহ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু বা সংগ্রামী মানসিকতার প্রকাশ।

আমরা সকলেই জানি, জীবনের উপান্তে পৌঁছে 'আধুনিকতা'কে এই সমকালীন বাস্তবতার নৈর্ব্যক্তিক চেহারায় দেখতে রবীন্দ্রনাথের কী প্রচণ্ড আপত্তি ও বিরাগ ছিল, যার কারণে তিনি তাঁর অনুলেখকদের সঙ্গে একাধিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন — এমন কি তাঁর কবিতায় আর উপন্যাসে সেই আধুনিকতার একটা সম্ভাব্য চেহারাও দেখতে চেয়েছেন। অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে এতে যে তিনি কখনো কখনো নিজের স্বভাব ও সৃজনক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছেন, সে কথাও আমরা জানি। তাঁর নাটক নিয়ে সেই বিতর্কভূমি তৈরি হয়েছে তাঁর প্রয়াণের পরে, এমন কি তাঁর জন্মশতবর্ষ ইত্যাদি উৎসব-উচ্ছ্বাসের মধ্য থেকে। তাঁর সমকালীন সময়ে এই বিতর্কের কোনো রূপরেখাই ছিল না, কারণ তিনি তাঁর অন্বেষা নিয়ে সরে গিয়েছিলেন স্বতন্ত্র এক আশ্রমিক জীবনে। সেই প্রতিবেশেই তিনি তাঁর প্রাপ্ত উপাদান এবং সাধ্যের মধ্যে থেকে বারবার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন সেই অন্বেষার যথার্থরূপ।

সন্দেহ নেই যে, একমাত্র 'বহুরূপী'ই রবীন্দ্রোত্তরকালে, এমন কি তাঁর সমসময় থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালির নাট্যধারায়, তিনদিক ঢাকা একদিক উন্মুক্ত 'বক্স স্টেজে'র চৌহদ্দীতে তাঁর নাট্যমুক্তি এবং জীবনসাধনার এক সার্থকতম রূপ উন্মোচন করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকের ভাষা থেকে শুরু করে তাঁর সমগ্র নাট্যআবয়বকে আমাদের দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গে মিলিয়েই পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন নিত্যসত্য অনুভবে। তাঁদের পাশাপাশি আর যাঁরা রবীন্দ্রনাটক চর্চা করেছেন, অন্তত একাধিকবার — যেমন ধরা যাক এল.টি.জি.ও উৎপল দত্ত — তাঁরা সেই নিত্যস্বরূপটি অনুধাবনে যথেষ্ট

মনোযোগী হন নি, যতটা তাৎক্ষণিক মঞ্চচমৎকারিত্বে দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যের সমকালীনতা জাহির করতে চেয়েছিলেন। 'অচলায়তন' অভিনয়ের কালে তাঁদেরও ঘোষণা ছিল "রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের উপযোগী নয় এ ধারণা অনেকের আছে। আমাদের নেই। তাই এই প্রয়াস। পাদপ্রদীপের আলোয় কিংবা রূপসজ্জাকরের হাতে নাটকের কাব্য বা দর্শন ফিকে হয়ে যাবে কি না সে বিতর্কের অবতারণা না করে যা আমরা সবচেয়ে বড়ো মনে করি তা নাট্যকাররূপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকে তর্কাতীত করা।"

১৯৫৩ সালে এই ঘোষণার তাৎপর্য কিছু কম ছিল না, কারণ তখনও বহুরূপীর 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় নি, 'রাজা' তখনো সুদূরপরাহত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, উৎপল দত্তের নাট্যচেতনার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাট্যের স্বভাবগত একটা বৈপরীত্য আছে। উপরন্তু, এ কথাও মনে রাখা ভাল যে, উৎপল দত্ত রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, শম্ভু মিত্রের আদর্শে কোনো বিশিষ্ট ভারতীয় নাট্যরীতিকেও বিশ্বাস করেন না। বাংলা থিয়েটার বিশেষভাবে ইউরোপীয় প্রভাবজাত এ কথা মনে রাখাই তাঁর পছন্দ (দ্র. Dutt, 1971 : 236-37)। সেইজন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ কিংবা গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৃতিকেও তিনি পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক বা নাট্যকার-কবিদের রচনাসূত্রে মিলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। সমস্ত মঞ্চটিকে ঘন নীল কাপড়ে ঢেকে, ন'টি ৩' x ৬' x ১$\frac{১}{২}$' পাটাতন এবং দুটি বড় ৩' সিঁড়ি দিয়ে সাজিয়ে তৈরি করেছিলেন শ্রীদত্ত 'অচলায়তনে'র পরিবেশ। নাটকের যাবতীয় সাংকেতিকতা ভেঙে দিয়ে, সমগ্র নাটকটিকে প্রবল সম্পাদনায় দৃশ্যসংস্থানের স্থানান্তর ঘটিয়ে, শুরু থেকেই প্রদীপ হাতে স্থবিরকদের শোভাযাত্রার 'ট্যাবলো', দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রখর আলোয় লাল টুপি সাদাধুতি পরিহিত শোণপাংশুদের তরবারিতে শান দেওয়া থেকে শুরু করে ক্লাউনের টুপি পরিহিত রাজাকে 'মনোহর গুপ্ত' নাম দিয়ে তাকে প্রায় ভাঁড়ে পরিণত করে, পঞ্চক ও আচার্যকে জেলে বন্দী থাকতে দেখিয়ে এবং প্রবল নাটকীয় শেষ দৃশ্যে দাদাঠাকুরের লাল পোশাকে সজ্জিত সৈন্যদল নিয়ে অচলায়তন ভেঙে প্রবেশ করা দেখিয়ে, এমন কি তাপস সেনের আলোর মায়ায় দর্শকদের উৎপলীয় রীতিতে চমকপ্রদ কৌতুকে মাতাতে পিছনের সাদা পর্দায় সাদা মুখ সাদা হাতে দৃশ্যমান ভূত দেখিয়ে তিনি হয়তো নাটকটিকে প্রত্যক্ষ মঞ্চমূর্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু আদতে নাটকটি অতখানি

নাট্যক্রিয়ার চমৎকারী প্রাবল্যের ঘাতসহ ছিল কিনা, সে বিচার থেকেই যায় ।

এর দু'বছর পর 'কালের যাত্রা' করেন তাঁরা । সে প্রযোজনাতেও শেষ পর্যন্ত মজুর-দের হাতে রথের চাকা গড়াল, এমন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশনা সব দর্শকের পছন্দ হয়নি । "স্বাধীনতা" পত্রিকার তারিখহীন "পাঠকের কলমে" বিভাগে দেখেছি, কমলাদেবী নামের এক দর্শক গা-ধীজীর অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের সময়ে লেখা এই নাটকে শূদ্র জাগরণের বদলে এই শ্রমিক চেতনার প্রকাশ মেনে নিতে পারেননি । উত্তরে উৎপল দত্ত জানান, তাঁরা রবী-দ্রনাথের ইপ্সিত রূপক চরিত্রটি নষ্ট করেন নি, কিন্তু রূপক নাটকের অমোঘ নীতি মেনেই তিনি এই নাটককে শুধু জাতিভেদপ্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার চেয়ে বৃহত্তর সমস্যা, শোষক-শোষিতের সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুলেছেন ।

শ্রীদত্ত ঠিকই বলেছিলেন । রবী-দ্রনাথের কোনো নাটকই কোনো এক বিশেষ সাময়িক-তার আশ্রয়ে গড়ে ওঠেনি । ঠিক সেই কারণেই ১৯২৩ সালের নাট্যপ্রবর্তনায় প্রমথনাথ বিশীর লেখা একটি নাটকের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লেখা 'রথযাত্রা' নামের গদ্যনাটকটির যে গদ্যছন্দিত রূপ প্রকাশ পেল ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে 'কালের যাত্রা'য়, তাতে ১৯৩০ সালের রাশিয়াভ্রমণেরও কোনো ছাপ পড়ে নি । এ নাটকে 'যন্ত্র-ধারা'র যন্ত্রকে কেন্দ্রে রেখে দেশগত আত্যাভিমান, অন্য দেশের উপর প্রভুত্ববিস্তারের কাহিনী থেকে শুরু করে এক সুস্পষ্ট সামাজিক উত্তরণ দেখা যায় । 'যন্ত্র-ধারা - রক্ত-করবী - কালের যাত্রা' — এই ত্রয়ী (Trilogy) নাটকের প্রথমটিতে দেখা যায় অস্পষ্ট আশ্বাস-আত্মবিসর্জনের পথে সে নাটকে কেবল থেকে যায় অতীতের ধ্বংসচিহ্ন । 'রক্ত-করবী'তে সে আশ্বাস এক স্পষ্ট সংগ্রামের পথে চালিত হল, মৃত্যু দিয়েই যে সংগ্রামে ঝাঁপাতে হয় বঞ্চিত মানুষকে । 'কালের যাত্রা'য় সেই বঞ্চিতদেরই জয় । অর্থাৎ যে সম্ভাব্য নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন এই শতাব্দীর শুরু থেকেই দেখতে শুরু করেন কবি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক প্রসারণে সেই সমাজসংগঠনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও সম্ভাবনার ছবি তিনি দেখে নিলেন এই নাট্যত্রয়ীতে । তাই ১৯১৯ সালে লেখা তাঁর 'বাতায়নিকের পত্র" (দ্র· ঠাকুর, ১৩৫৪, '১৩২৭' : ৫৬৯ - ৭১) প্রবন্ধেই এসে যায় 'রথযাত্রা' প্রসঙ্গ, আবার 'কালের যাত্রা'র শেষেও এই নতুন সমাজের

বিপজ্জনক ভবিষ্যৎও দেখে নেন তিনি। মনে রাখতে হবে, 'রাশিয়ার চিঠি'-তেই সমাজতন্ত্রের সেই যান্ত্রিকতার সম্পর্কে তাঁর সংশয় কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল — যে কারণে এই বইয়ের কিছু কিছু অংশ রাশিয়ায় এতকাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লবের সেই যান্ত্রিকতার ইঙ্গিত আছে বলেই একদা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এর সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন। বহুরূপী-র অভিনয়ের পর তাঁর সে সংশয় কেটে যায়, কিন্তু কট্টর বামপন্থীমহলে বহুরূপী স্বাভাবিকভাবেই সমালোচিত হন।

উৎপল দত্তের রবীন্দ্রবীক্ষা এরই উল্টো দিক হয়ে ধরা দেয়। আধুনিক পোশাকে তিনি 'কালের যাত্রা'-র চরিত্রগুলিকে সাজান, এমন কি যন্ত্রীকে তিনি জহরকোট ও তার বাটনহোলে একটি গোলাপ গুঁজে মঞ্চে পাঠান। এই প্রতীকায়নে সমসাময়িক রাজনৈতিকতার ব্যঙ্গাত্মকরূপ প্রকাশ পায় ঠিকই, কিন্তু তাতে মূলের গূঢ়ার্থ নষ্ট হয় বলেই আমাদের ধারণা। বস্তুত সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারে অনেক সময়েই নাটক নির্বাচন করা হয় একটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কারণে, এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। গান্ধার যেমন 'বিসর্জন' প্রযোজনা করেন খালিস্তানী আন্দোলনের প্ররোচনায়, বহুরূপী'র 'মালিনী' নাটকের পিছনেও ঐ আন্দোলন প্রধান ইন্ধন জোগায়। অথবা বিভাস চক্রবর্তী ভাবেন গুজরাটের নর্মদা নদীতীরে শায়িত বাবা আমতের অনশনের প্রেক্ষিতে 'মুক্তধারা'র যন্ত্রায়ন ঘটাতে। (চক্রবর্তী, ১৯৯১ : ১১)
এই সাময়িকী তাৎক্ষণিকতা কেবল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নয়, বিদেশী নাট্যকার নাট্যনির্দেশকদের বঙ্গীকরণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাই কলকাতায় এক সময় রবীন্দ্রনাথের নাটকের মতো বের্টোল্ট ব্রেশট্ [1898–1956]-এর একাধিক নাটক, কখনো বা একই নাটক একাধিক দল প্রযোজনা করলেও কে কতদূর ব্রেশটীয় হতে পারলেন, তাই নিয়ে বিতর্কে উত্তাল হয়েছে বাংলার নাট্যামোদী মহল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সার্থক রবীন্দ্রায়নের বিতর্ক তাই অস্বাভাবিক নয়।

এরই একটি উল্টো দিক হল সমগ্র দেশজুড়ে ভারতীয় নাট্যরীতির অন্বেষণ। যেহেতু, স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর 'ভারতীয় মৃত্তিকা বিষয়ে আমাদের বোধ বা কৌতূহল অস্পষ্ট থেকে আরো অস্পষ্টতর দিকে মিলিয়ে গেছে' (ঘোষ, ১৯৮৯ : ১৫), তাই ভারতীয়তা বলতে আমাদের চোখে প্রতিবিম্বিত প্রাচীন লোকজ আচার, যন্ত্রতন্ত্র,

ঝাড়ফুঁক, গ্রাম্য গাথায় বা পাঁচালিতে সাজানো এক অ-সভ্য মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ। সারা ভারতের নানা প্রদেশে নাট্যকর্মীদের এক-একটি লোকরীতির পুনরুদ্ধার ও তার মধ্যে নাট্যগুণ আবিষ্কার কিংবা যোজনা নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলার বারো বছরের (১৯৮৪-৯৬) আয়োজনে আমাদের 'ক্লান্ত, ক্লান্ত করে' চলেছে। অথচ যথার্থ ভারতসত্তার উদ্বোধনে দেশজতা ও আন্তর্জাতিকতায় মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক ও জাতীয়, প্রাত্যহিকতা থেকে উত্তীর্ণ, দৈনন্দিনতা আর চিরায়তে বিমিশ্র এক গতায়াতপথ তৈরি করেছিলেন তাঁর নাট্যপরম্পরায় — উপযুক্ত ধৈর্য, শিশিক্ষুর অধ্যবসায় এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ালাভের মোহাভ্রান্ত বাংলা নাট্য বহুরূপীর সংগ্রাম ও শিক্ষা থেকে কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে পারল না। এ নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজও যে রবীন্দ্রনাটক অ-নিয়মিতভাবে অভিনীত হতে পারছে, তার মূলে কতখানি গূঢ় অন্বেষা আর কতখানি রবীন্দ্রচর্চার আভিজাত্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল থাকে, তা বোঝা দুষ্কর। এই অবস্থার মধ্যেই ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত বহরমপুরের ছান্দিকের 'অচলায়তন' যখন মোট বত্রিশটি অভিনয় করে, তখন আশা জাগে।

রবীন্দ্রনাটকের রসাবেদন গ্রহণ করবার আর এক প্রধান অন্তরায় বাংলার নাট্য-সমালোচনা। ১৯৬২ সালে সবিতাব্রত দত্ত [১৯২৪-৯৫] নির্দেশিত রূপকার গোষ্ঠীর 'কালের যাত্রা' দেখে কোনো সমালোচক মুগ্ধ হন নাটকটির দলগত অভিনয় ও গানে, কিন্তু খালেদ চৌধুরী-কৃত প্রতীকী মঞ্চের আধুনিক শিল্পগত ও নাট্যগত তাৎপর্য তাঁর মাথাতেই ঢোকে না। শ্রীচৌধুরী তাঁর কাঠামোগত (Structural) মঞ্চবিন্যাসে নাটকের সামাজিক নানা স্তরের কাঠামোকে নাট্যক্রিয়াগত তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে দেখাতে চান বলে এক বিরাট উচ্চতা ও আয়তনের রৈখিক বালুঘড়ি, ওজন যন্ত্র, মন্দির ও তার চূড়ায় এক স্বস্তিক চিহ্ন সাজালেন। (দ্র· দিলীপ চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রের মুদ্রিত রূপ, চৌধুরী, ১৪০২ : ৪৩) অথচ তাঁর ভাষায় "বয়স্ক লোক, নিজে নাট্যকার এবং গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত" (তদেব : ৪২) এক সমালোচক "যুগান্তর" পত্রিকার ১ জুন ১৯৬২-র প্রতিবেদনে লেখেন "নীল পর্দার সামনে মন্দির ও দুটি বলয় রেখাচিত্রের মতো সুন্দর মানিয়েছিল। নাটকের শেষ পর্বে নেপথ্য থেকে পর্দা ফাঁক করে বলয়ের মধ্যে দিয়ে শূদ্রদের দ্রুতগতিতে ক্রমিক

প্রবেশ নাটকে যথেষ্ট গতি এনে দিয়েছিল।" রেখাচিত্রের ব্যবহার-কৌশল তিনি বুঝতে পারেন, কিন্তু যে নাটকের নাম 'কালের যাত্রা', সেখানে সময়ের পথ ভেদ করে শূদ্রদের প্রবেশ তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন না। নাটকে দেবতার যে পথকে "আদি পথ, পবিত্র পথ" বলা হয়েছে, তারই ব্যঞ্জনায় মন্দিরচূড়ায় আসে ব্রহ্মার স্মারক, অথচ সমালোচকের মনে হয় মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল।

এইভাবে, আমাদের অভ্যস্ত নাটকীয়তার বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় ও সমালোচনার বিচিত্র বৃত্তান্ত আরও পেশ করা যায়। কিন্তু সে বিস্তারে না গিয়ে শেষ কথা হিশাবে কেবল এইটুকু বলা যায়, সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় তথা বাঙালিমানসে পুনর্বার যে জাতীয়চেতনায় পৌঁছবার আগ্রহ দেখা দিয়েছে – যে আগ্রহবশত ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদিয়েফের [1789-1817] বাংলায় নাট্যপ্রচেষ্টাকে অস্বীকার করে বাংলা থিয়েটারের দ্বি-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অযৌক্তিকতা নিয়ে নানা মতামত গড়ে উঠছে নাট্যামোদী ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে – সেই আগ্রহেই নিরালম্ব, লক্ষ্যহীন রবীন্দ্রচর্চা নয়; হয় রবীন্দ্রনাট্যমুক্তির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত মনে রেখে তাঁর জাতীয়মানসপ্রতিনিধিমূলক নাটকগুলির নবমঞ্চায়নে আধুনিক নাট্যচর্চাকে নতুন করে অভিনিবিষ্ট হতে হবে, নতুবা তাঁর থেকে শিক্ষা নিয়ে খুঁজতে হবে সর্বাঙ্গীণ নাট্যমুক্তির পথ। যে নাট্যমুক্তি অন্তত রচনা-আকারে ঘটাতে পেরেছিলেন শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা'য়। এ নাটকের উপযুক্ত মঞ্চায়ন কোনোদিন সম্ভব হলে রবীন্দ্রনাট্যঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকার তৈরি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শঙ্খ ঘোষের বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চযোগ্যতার বিচার শেষে এ কথাই বলা যায় - "বাইরের থেকে আরোপে নয়, ভিতর থেকে উদ্‌ভাবনে" (ঘোষ, ১৯৮৩: ১৯৯-২০৪)-ই একমাত্র সম্ভব, বহুরূপীর ঐতিহাসিক সার্থকতার পরেও রবীন্দ্রনাটকের আধুনিকতর মহৎ কোনো মঞ্চযোগ্য রূপ সৃষ্টি করা। অন্তত তার জন্য রবীন্দ্র-নাথের অনেক নাটকই এখনো অপেক্ষা করে আছে।।